স্বামী বিবেকানন্দের ‘নূতন ভারত’

গৌরী ভৌমিক

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ‘শিবজ্ঞানে জীবসেবা’র চাপরাশবাহক সমগ্র মানবজাতির মুক্তিকামী একনিষ্ঠ সংগ্রামী। তাঁর লক্ষ্য ছিল মানবাত্মার বিকাশের মাধ্যমে জাতির নবনির্মাণ, পরাধীন দেশবাসীর আত্মশক্তিকে জাগ্রত করে তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধের পুনঃস্থাপন। ব্যক্তিমানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির সর্বোচ্চ বিকাশের লক্ষ্যে তিনি এক নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তের উচ্চ তত্ত্বগুলি প্রয়োগের মাধ্যমে তার উপায় সন্ধান করেছিলেন।

স্বামীজী তাঁর আর্ষ দৃষ্টি এবং ইতিহাসচেতনা দিয়ে ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীত ও সমকালীন অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে নির্ধারণ করেছিলেন ভবিষ্যৎ ভারতের রূপরেখা। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, প্রাচীন ভারতভূমি পৃথিবীর মহান আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের উৎসস্থল এবং ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শগুলি পরিণতি লাভ করেছে এখানেই। শত অত্যাচার, বৈদেশিক আক্রমণ, রীতিনীতির বিপর্যয় সহ্য করেও এই দেশ নিজ অবিনাশী বীর্য ও জীবনীশক্তি নিয়ে অচল অটল দৃঢ়তায় দণ্ডায়মান। এই সমৃদ্ধ অতীতের গর্ভেই জন্ম নেবে ভবিষ্যৎ ভারত। মধ্যবর্তী অস্থিরতার সময়টুকু তাঁর মতে, সমুদ্রের তরঙ্গমালার উত্থান-পতনের মতোই অনিবার্য এবং এই অবনতি থেকেই পূর্বাপেক্ষা মহত্তর নতুন ভারতের অভ্যুদয় ঘটবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বহু ভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতায় স্বামীজী দেখেছেন, প্রত্যেক জাতির একটি প্রধান আদর্শ, একটি নিজস্ব মূল ভাব থাকে, যা ওই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। সেই নিজস্ব জাতীয় ভাব অবলম্বন করে সুসমন্বিত চারিত্রিক উৎকর্ষ লাভ করা এবং অপরকেও এ-বিষয়ে সর্ববিধ সহায়তাদানের মধ্যেই নিহিত সামাজিক উন্নতির চাবিকাঠি। কোনও জাতির জীবনের মূল ভিত্তি রাজনীতি, কারও বা অন্য কিছু। তেমনি, ‘‘আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম—শুধু ধর্মই।’’[১] এই ধর্মভাব যে ভারতীয় জীবনধারার পক্ষে কতখানি অপরিহার্য তা নির্ণয় করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন, ‘‘ভালই হউক আর মন্দই হউক—সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ ভারতে ধর্মই জীবনের চরম আদর্শরূপে পরিগণিত হইতেছে;... ভালই হউক আর মন্দই হউক—ধর্মের এইসকল আদর্শের মধ্যেই আমরা পরিবর্ধিত হইয়াছি; এখন ঐ ধর্মভাব আমাদের রক্তের

সহিত মিশিয়া গিয়াছে... আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে, আমাদের জীবনীশক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"[২] এই ধর্মভাব থেকে বিচ্যুতিই ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক অবনতির কারণ এবং ভাবী ভারতের উন্নতি ও কল্যাণের একমাত্র উপায় একে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা। বলা বাহুল্য, স্বামীজীর এই ধর্মচেতনা প্রচলিত ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর মতে, প্রকৃত ধর্ম হল ব্যক্তির অন্তরতর ঐশী শক্তির পূর্ণ বিকাশ ও মনুষ্যত্বলাভ এবং এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা— লৌকিক শিক্ষার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা, যা ব্যক্তিকে সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা, নীতিপরায়ণতা, প্রেমানুভূতি ও পরার্থপরতায় দীক্ষিত করে। এগুলি পৃথিবীর যেকোনও ধর্মেই সর্বোচ্চ আদর্শরূপে স্বীকৃত এবং যেকোনও দেশের ব্যক্তি তথা জাতিকে তা সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে চালিত করতে পারে। নতুন ভারত গঠনের লক্ষ্যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে এই সর্বজনীন ধর্মের ভিত্তির উপর স্থাপনের কথা স্বামীজী বলেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, আত্মার অভিন্নতা প্রতিপাদক 'বৈদান্তিক মস্তিষ্ক' আর সাম্য, মৈত্রী ও সংহতির মহান আদর্শরূপ 'ইসলামিক দেহ' নিয়ে গড়ে উঠুক নতুন ভারতবর্ষ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীন ভারতে সকলের জন্য শিক্ষার সমানাধিকারে গুরুত্ব আরোপ করা হলেও জাতীয় ধর্মভাবটিকে রক্ষা করার কোনও চেষ্টাই করা হয়নি। বরং সংবিধানে উল্লিখিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্ম ব্যতিরিক্ত করে ফেলা হয়েছে, যার বিষময় ফল সামাজিক নানা বিকৃতি এবং মূল্যবোধের অবনমন।

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, এই যুগসংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ভারতকে আবার বৈদান্তিক আদর্শে উজ্জীবিত করে তুলতে হবে। বেদান্তে আত্মার যে-অনন্ত শক্তি ও নিত্য শুদ্ধতার কথা বলা হয়েছে, তাকে অবগত হয়ে জয় করতে হবে জড়শক্তিকে। তিনি বলেছেন, ''ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয় পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশসহায়ে; অর্থের শক্তিতে নয়, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে।"[৩] এমনকী জড়শক্তির লীলাভূমি ইউরোপকেও ধ্বংসের অনিবার্যতা থেকে রক্ষা পেতে হলে এই বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতাকে তাদের জড়সভ্যতার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতেই হবে।

নতুন ভারতের প্রস্তুতি পর্যায়ে স্বামীজী সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন নব্য ভারতের যোগ্য উত্তরাধিকারী নির্মাণের উপর। তিনি দেখেছিলেন, আর্থ-সামাজিক দৈন্যের পাশাপাশি কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা, পারস্পরিক ভেদবুদ্ধি এই জাতিকে হীনবল করে ফেলেছে এবং বুঝেছিলেন, জনসাধারণের (mass) মধ্যে শিক্ষা ও প্রকৃত ধর্মবোধের অভাবই জাতীয় এই অধঃপতনের মূল কারণ। তাই যদি নতুন ও উন্নত সমাজ গঠন করতে হয়, তবে এই জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা দিয়ে, তাদের চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে প্রকৃত মানুষ করে তুলতে হবে। সেইসঙ্গে তাদের মধ্যে 'গৌরববোধ' ও 'সংস্কার' জন্মাতে হবে, যাতে তারা কৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে ভাববিপ্লব সহ্য করার সক্ষমতা অর্জন করে।

এইরকম উন্নত সমাজ গঠনের জন্য নারীর হৃতমর্যাদার পুনঃস্থাপন আবশ্যিক। স্বামীজীর মতে, নারীজাতির প্রতি অবহেলাই ভারতবর্ষকে ক্রমশ শ্রীহীন ও শক্তিহীন করে ফেলেছে। মনুকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, ''যেখানে... স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের—সে দেশের কখনও উন্নতির আশা নেই।"[৪] অতএব, সমৃদ্ধ নতুন ভারত গঠন করতে হলে উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠার পথ খুলে দিতে হবে। তাঁর বিশ্বাস, ভারতে

গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সীতা, সাবিত্রীর যুগ শেষ হয়ে যায়নি। ধর্মপরায়ণতা, ত্যাগ, সংযম, সেবাধর্ম এদেশের নারীদের শোণিতে প্রবহমান। কেবল অজ্ঞানের অন্ধকারটুকু দূর হলেই ভারতে আবার এমন মহীয়সী নারীদের অভ্যুদয় ঘটবে। আজ সমাজের সর্বস্তরে নারীর জাগরণ তারই অরুণাভাস।

ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক নবজাগরণের জন্য সর্বাগ্রে তাদের ঐহিক দারিদ্র্য ঘুচিয়ে, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা স্বামীজী অনুভব করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, ভবিষ্যৎ ভারতের আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে দৃঢ়তর করে তুলতে হলে, নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধির নামে আলস্যপ্রিয় ভারতবাসীর মধ্যে রজোগুণের উদ্দীপনা সঞ্চার করতে হবে, তাদের কর্মমুখী করে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করে তুলতে হবে; এবং এর জন্য জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে হাত না পেতে আমাদের উপায় নেই। তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবহারিক জ্ঞান, কর্মতৎপরতা ও আত্মনির্ভরতা এবং চিন্তার স্বাধীনতা যদি এদেশের মানুষে সঞ্চারিত করা যায়, তাহলে তারা নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বন করেই উন্নয়নের পথ খুঁজে পাবে। সেইসঙ্গে কূপমণ্ডূকতা ত্যাগ করে বহির্বিশ্বে ভ্রমণ, অন্যান্য জাতির চিন্তার সঙ্গে অবাধ সংস্রব এবং বিদেশের বাজারে দেশি সামগ্রীর জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করে বাণিজ্যে অগ্রগতির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ভারত লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করবে। বর্তমান বিশ্ব-অর্থনীতিতে ভারতের গৌরবজনক অবস্থান শতাধিক বৎসর আগেই ক্রান্তদর্শী স্বামীজী প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

স্বামীজী মনে করতেন, মানুষের অন্তরসত্তা যেহেতু সততই বিকাশোন্মুখ, তাই স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। তবে তাঁর কাছে স্বাধীনতার অর্থ কেবল রাজনৈতিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি নয়, পরন্তু মানবাত্মার সর্ববিধ বন্ধনমুক্তি। ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রমাণ করে, প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের মানুষ ধর্মচিন্তায় স্বাধীনতা পেয়েছে, তাই সেক্ষেত্রে তাদের উন্নতির পথ ছিল মসৃণ। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা তারা পায়নি, তাই সেক্ষেত্রে উন্নতির পথ হয়েছে অবরুদ্ধ। আচার ও কুসংস্কারের দাপটে অভিন্ন ব্রহ্মসত্তা হারিয়ে গিয়ে প্রবল হয়েছে সামাজিক নানা বৈষম্য ও শোষণ—পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক জ্ঞানালোকহীন জনগোষ্ঠীকে শোষণ, উচ্চবিত্ত কর্তৃক নিম্নবিত্তকে শোষণ ও সর্বোপরি জাতপাতের ভিত্তিতে উচ্চবর্ণ কর্তৃক নিম্নবর্ণকে শোষণ।

বস্তুতপক্ষে, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের দুরবস্থার জন্য বিদেশি শাসকের অপশাসনের চেয়ে এই সামাজিক বৈষম্যজনিত নিপীড়নকেই স্বামীজী অধিক দায়ী করেছেন। দেশের অভিজাত সম্প্রদায় সাধারণ কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে শতাব্দীর পর শতাব্দী নিজেদের কাজে লাগিয়েছে, সর্বপ্রকার জ্ঞানালোক থেকে দূরে রেখে তাদের অতি বাধ্য মানবপশুতে পরিণত করেছে। শূদ্র বলে পরিচিত এদের প্রতি অবহেলাকে স্বামীজী ‘প্রবল জাতীয় পাপ’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এইসব অবহেলিত মানুষের শোষণমুক্তির মধ্য দিয়ে জেগে উঠবে নতুন ভারতবর্ষ। স্থান ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে হবে তথাকথিত অভিজাতশ্রেণিকে। এদের প্রতি তীব্র শ্লেষ ব্যক্ত হয়েছে তাঁর ‘নূতন ভারত’-এর আগমনীতে : ‘‘এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা!... তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে।... এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে... তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা।... অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু

খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন।... এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।... তোমরা যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি-জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্য-কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি—'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে।' ''[৫]

বিশ্ব-ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে স্বামীজী দেখেছেন, মানবসমাজ ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি শ্রেণি দ্বারা শাসিত হয় এবং এক এক শ্রেণির অভ্যুদয়কালে দেশ ও সমাজ অগ্রগতির নব নব পথ আবিষ্কার করে। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। ''প্রথম তিনটির পালা শেষ হয়েছে—এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসবেই আসবে—এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।''[৬] অষ্টাদশ শতকের শিল্পবিপ্লবকে কেন্দ্র করে ইউরোপে বৈশ্যশক্তির যে-অভ্যুদয় ঘটেছিল, তারই প্রভাবে ভারতবর্ষে 'ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত' হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে স্বামী বিবেকানন্দের নতুন ভারতভাবনায় শূদ্রজাগরণের ইঙ্গিত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে মনে রাখতে হবে, শূদ্রজাগরণের মধ্য দিয়ে স্বামীজী আসলে এক ক্রমপরিণত সমাজ- ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। কোনও একটি শ্রেণির একাধিপত্যে নয়, পরন্তু এই চারটি শ্রেণির বৃত্তি অনুসারী সার্বিক বিকাশ এবং পারস্পরিক সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সমাজের কল্যাণকর পরিবর্তন হতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই বলেছেন, ''যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণশক্তি এবং শূদ্রের সাম্যাদর্শ—এই সবগুলি ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।''[৭] তিনি আশা করেছেন, এই শ্রেণিসমন্বয়ের পথেই গড়ে উঠবে নবভারত।

মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারে, এই শূদ্র-অভ্যুত্থান ঘটবে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এবং তাদের একাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হবে সামাজিক সাম্য। কিন্তু স্বামীজীর কাছে শূদ্রজাগরণের অর্থ হল একটা ভাববিপ্লবের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণত্বে উত্তরণ। যখন মানুষ হিংসা ও পাশব বৃত্তিকে জয় করে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবে—সূচনা হবে সত্যযুগের। তিনি বলেছেন, ''এই সত্যযুগে এক বর্ণ, এক বেদ হবে এবং সমগ্র জগতে শান্তি ও সমন্বয় স্থাপিত হবে। এই সত্যযুগের ধারণা অবলম্বন করেই ভারত আবার নবজীবন পাবে।''[৮]

মার্কসীয় তত্ত্বের ভিত্তি শিল্পবিপ্লবোত্তর অষ্টাদশ শতকের প্রচলিত মূল্যবোধ। আর স্বামীজী যে-সামাজিক সাম্যের কথা বলেছেন তার ভিত্তি ভারতের সনাতন বৈদান্তিক মূল্যবোধ। বেদান্তের সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, 'এই জগতের সবকিছু ব্রহ্মময়'—তত্ত্ব অবগত হয়ে মানুষমাত্রই পরস্পরকে অভিন্ন ব্রহ্মসত্তারূপে অনুভব করবে এবং স্বার্থবুদ্ধিত্যাগ ও পারস্পরিক সেবাভাবে উদ্বুদ্ধ হবে। স্বামীজীর মতে, শুধুমাত্র এভাবেই সমাজের প্রকৃত মহাসাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে সাধারণ মানুষের উন্নতিকল্পে সকলের জন্য শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও জীবিকার সুনিশ্চয়তা দানের বহুবিধ ব্যবস্থা গৃহীত হলেও এই সনাতন মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুতি সমাজের সর্বস্তরে আজ সৃষ্টি করেছে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসহীন অনিশ্চয়তার এক চোরাবালি।

স্বামীজী ভারতবর্ষকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজে দেশের যুবসমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, পরাধীন জাতির কাছে গরীয়সী মাতৃভূমিই একমাত্র দেবতা, স্বদেশবাসীই একমাত্র উপাস্য। গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ ধনীদের উপর তাঁর আস্থা ছিল না। পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু 'আশাপূর্ণ বলিষ্ঠ দৃঢ়চেতা ও মেধাবী' যুবকরাই ছিল তাঁর ভরসাস্থল। মাদ্রাজবাসী যুবকদের কাছে লেখা

এক পত্রে দেশের তরুণ প্রজন্মকে উদ্দেশ করে স্বামীজী লিখেছেন, ''আমি তোমাদের নিকট এই গরিব অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা—দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি।... তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।''[৯] অন্য এক পত্রে লিখেছেন, ''যাবতীয় কল্যাণ-শক্তিকে মিলিত কর। তুমি কোন্ পতাকার নিম্নে থাকিয়া যাত্রা করিতেছ, সেদিকে লক্ষ্য করিও না। তোমার পতাকা নীল, সবুজ বা লোহিত, তাহা গ্রাহ্য করিও না; সমুদয় রঙ্ মিশাইয়া প্রেমের শুভ্রবর্ণের তীব্র জ্যোতি প্রকাশ কর।... আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, আমাদের সেই প্রাচীনা জননী আবার জাগিয়া উঠিয়া পুনর্বার নবযৌবনশালিনী ও পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে মহিমান্বিতা হইয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছেন।''[১০] দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজও আমরা এইভাবে দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে প্রকৃত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে পারিনি।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে জাগৃতির মহামন্ত্র শুনিয়েছিলেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—ওঠো, জাগো, চরম লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত থেমো না—কোনও বিশেষ জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতিভূরূপে নয়, অখণ্ড ভারতবর্ষে 'যুগের নবাভিযানের পথিকৃৎ'রূপে। তাঁর ভারতচেতনা অভিভূত করেছিল স্বদেশের মুক্তিকামী বীর সৈনিকদের, যাঁরা স্বামীজীর দেখানো 'নূতন ভারত'-এর স্বপ্ন চোখে নিয়ে শহিদ হয়েছেন। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষকে ভৌগোলিক অখণ্ডতা আজ হয়তো আর ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না, কিন্তু স্বামীজী নবযুগের যে-নববেদ প্রচার করেছেন, তাকে অবলম্বন করে আজকের স্বাধীন ভারতের অধিবাসী আমরা কি গ্রহণ করতে পারি না সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার দায়?

তথ্যসূত্র

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা), খণ্ড ৫ (২০০৩), পৃঃ ৫০
২। তদেব, পৃঃ ৫১
৩। তদেব, পৃঃ ৩৬৩
৪। তদেব, খণ্ড ৯ (২০০২), পৃঃ ১২৭
৫। তদেব, খণ্ড ৬ (২০০১), পৃঃ ৬৪-৬৫
৬। তদেব, খণ্ড ৭ (২০০৪), পৃঃ ২৩৭
৭। তদেব
৮। তদেব, খণ্ড ৬, পৃঃ ৩২৮
৯। তদেব, পৃঃ ২৮৮
১০। তদেব, খণ্ড ৫, পৃঃ ৩৬৪

সংগ্রহ

স্বয়ংবাদী

লস এঞ্জেলেসে থাকাকালীন তাঁর (স্বামীজীর) সম্বন্ধে একটা অপবাদ রটেছিল, ঐ প্রসঙ্গে আমি তাঁর এক অপূর্ব ভঙ্গিমা দেখেছিলাম।... কথাপ্রসঙ্গে ঐ বিষয়টি ওঠে...। শেষে তিনি বললেন, ''দেখুন, আমি যা, তা আমার কপালে লেখা আছে। যদি আপনারা তা পড়তে পারেন, তাহলে আপনারা ভাগ্যবান। যদি না পারেন তাহলে আপনাদেরই ক্ষতি—আমার নয়।''

স্বামী চেতনানন্দ, *বহুরূপে বিবেকানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০১২), মিসেস অ্যালিস এম হ্যান্সব্রো-র স্মৃতিকথা, পৃঃ ১৫৩